ISSN 1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দশম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১২/নভেম্বর ২০০৫

বাংলাদেশের চা বাগান : প্রশাসনিক সংস্কৃতির পর্যালোচনা

কে এম মহিউদ্দিন*

Abstract: *Bangladesh is a small tea producing country having 158 tea gardens. Tea garden was first established at Malnicherra in Sylhet in 1857. Tea industry has been developed as agro based labor-intensive sector. Since the colonial days, tea workers are perhaps the most oppressed in the organized sector of the economy. They work in a dictatorial atmosphere where they are treated as bonded laborers. They are also obliged to follow established rules and regulations without asking any question. If any one breaks the law, she/he must be dismissed from the estate and dismissed worker does not get employment opportunity in any other tea estates. Management mostly follows traditional norms, rules and regulations practiced during the colonial period. Main objective of this paper is to discuss the relationship between management and working class.*

ভূমিকা

চা বাগান ও চা শ্রমিকদের জীবন বাংলা সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হলেও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় বিশেষত বাংলাদেশে খুব গুরুত্ব পায়নি। জ্ঞান চর্চার পরিসরে চা শ্রমিকগণ অনুসন্ধান বা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। এর কারণ এই যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগণ চা শিল্প প্রতিষ্ঠা করে যা কৃষিভিত্তিক সমাজের কৃষি পদ্ধতি ও কৃষকের জীবন থেকে আলাদা ধরনের। তাছাড়া চা চাষ হয় পাহাড়ী এলাকায় যা সমতলবাসীদের কাছে ভৌগলিকভাবে প্রান্তিক। চা চাষে নিয়োগ পায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শ্রমিক যারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক এবং তাদের জীবন যাপন প্রণালী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। সর্বোপরি একটু ভিন্ন ধরনের এই চাষাবাদ ও শিল্পকে লাভজনক করার জন্য ঔপনিবেশিক শাষকবর্গ এতে আরোপ করে কঠিন শৃঙ্খলার নামে চরম আধিপত্যবাদ। সবমিলে বিচ্ছিন্নতাবাদ, একাকিত্ব, প্রান্তিকতা, ভিন্নতা এসব বিশেষণের আচ্ছাদনে আবৃত হয়ে থাকে এই শিল্প ক্ষেত্রটি। সমাজবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের জন্য এই শিল্পটি পুরোপুরি উম্মুক্ত ও সুবিধাজনক ছিল না।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, চা শিল্প কেন্দ্রিক যে 'মীথ' বা 'মিথ্রি' ঐতিহাসিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট 'সাবঅলটার্ন' বা নিম্নবর্গের ন্যায়। ঔপনিবেশিক ক্ষমতাসম্পর্কের মধ্যে চা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমিকবর্গকে নিম্নবর্গীয় 'কাষ্ট' বা জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত করে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে 'প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট' বা দাতা-গ্রহিতা কিংবা প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় আধিপত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। উচ্চবর্গ মালিক শ্রেণী তাদের চিন্তা, চেতনা ও মতাদর্শ দ্বারা নিম্নবর্গের শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে নিজেদের সকল কাজের সম্মতি আদায় করে নেয়। আর এই প্রভুত্বের ও অধীনতার সংস্কৃতি প্রকাশিত হয়

* সহকারী অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

শ্রমিকদের জীবনযাপন, বিশ্বাস, আচার-আচরণের মধ্যে। আবার শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও ভাবাদর্শ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, রিচ্যুয়াল, উৎসব কিংবা আচার-আচরণের মাধ্যমে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তাদের প্রতিবাদকে প্রশমিত করে, কোন কোন ক্ষেত্রে দমন করে, ধ্বংস করে পুঁজিবাদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখে। এর ফলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বদল হলেও চা শিল্পে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা-সম্পর্কের তেমন বদল হয়নি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে কর্তৃত্বের, প্রভূত্বের ও শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তা থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চা শিল্পের আমূল কোন পরিবর্তন হয়নি, ছোট ছোট পরিবর্তনের কথা বলা যায় কিন্তু তা' ঔপনিবেশিক মেজাজ বা সংস্কৃতির ভিন্ন পোশাক মাত্র। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে চা শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনাপূর্বক চা বাগান ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে উৎপাদন-সম্পর্ক ও ক্ষমতার সংস্কৃতিতে আলোকপাত করা হয়েছে। সরেজমিন মাঠ গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে সিলেট শহরের সন্নিকটে লাক্কাতুরা চা বাগান এবং হবিগঞ্জ জেলার চন্ডীছড়া চা বাগান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য চা শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং চা ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পাশাপাশি গবেষণা এলাকায় অবস্থান করে চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ধরন ও উৎসব অনুষ্ঠানাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎস ব্যবহারের পাশাপাশি সেকেন্ডারী উৎস থেকেও গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর জন্য বই, পত্র ও আর্কাইভস্ এর সাহায্য নেয়া হয়েছে।

ক. চা শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

চা কবে কখন উৎপত্তি হয়েছিল এ নিয়ে নানান ধরনের মত ও মীথ প্রচলিত রয়েছে। তবে সবচেয়ে প্রচলিত ইতিহাসটি এই যে, চা আবিস্কৃত হয়েছিল চীন দেশে খৃষ্টপূর্ব ২৭৩৭ অব্দে, রাজা চেন নাং Chen Nong চা আবিষ্কার করেছিলেন। তবে পানীয় হিসেবে ৬২০ খৃষ্টাব্দে মানুষ চা গ্রহণ করতে শুরু করে, তার কয়েক বছরের মধ্যে চা পানের ব্যাপক ব্যাপ্তি ঘটে এবং সেই সাথে চা ব্যবসারও সূত্রপাত ও সম্প্রসারণ। ইউরোপে চা এর প্রবেশ ঘটে ওলন্দাজ বণিকদের মাধ্যমে, যদিও পর্তুগীজ বণিক ভাস্কো দা গামা ১৪৯৭ সালে ম্যাকাও দ্বীপে পা রাখবার পর চা -এর সাথে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটে কিন্তু ব্যবসার চেয়ে চা-এর বিবরণ লিপিবদ্ধকরণেই তাদের অবদান বেশি ছিল। ভারতের মসলা এবং চীন থেকে নিয়ে আসা চা এর উপর ডাচ ও পর্তুগীজদের একচেটিয়া বাণিজ্যকে চ্যালেঞ্জ করে ইংল্যান্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাণী প্রথম এলিজাবেথ ১৬০০ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (Governor and company of Merchants of London Trading with East Indies) কে বাণিজ্য করবার সনদ প্রদান করে। তারপরের ইতিহাস বাণিজ্যিক স্বার্থে ডাচ ও পর্তুগীজ এবং তারও পরে ভারতীয়দের সাথে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস, ভারতীয়দের স্বাধীনতা লুন্ঠনের ইতিহাস, চা উৎপাদনের নামে নতুন আঙ্গিকে মানুষের শ্রম শোষণের ইতিহাস।[১] চা উৎপাদন ও বাণিজ্যে চীনের একচেটিয়াত্ব খর্ব করে ভারত উপনিবেশে চা এর আবাদ কিভাবে শোষণের এক নতুন ইতিহাস রচনা করে তার বিশ্লেষণ ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মম ও কদর্য দিকটি তুলে ধরতে পারে ।

ভারতে চা শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। ভারতে চা চাষের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ শুরু করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ১৮২১ সালে মেজর ব্রুস এবং ১৮২৪ সালে ডেভিট স্কট আসামে চা গাছ আবিস্কার করেছিলেন। এতে প্রমাণীত হয় যে আসামে আমদানী করা চা বীজ থেকে চা আবাদ শুরু করবার পূর্ব থেকেই এতদঞ্চলে চা গাছের অস্তিত্ব ছিলো এবং নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল ছিল চা চাষের উপযোগী। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবার ভারতের লুকিয়ে থাকা সম্পদকে নিজেদের মুনাফার জন্য বাণিজ্যিকভাবে আবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভারতে চা চাষের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ১৮৩৪ সালে ১৩ জন সদস্য নিয়ে "চা কমিটি" গঠন করেন । চা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বড় লাটের এজেন্ট সদিয়া ও বিশাত হতে ১৮৩৪ সালেই কমিটির কাছে চা বীজ ও কিছু পাতা পাঠিয়ে দেয়, কমিটি এগুলো পরীক্ষা করে ভারতে চা গাছের আবিষ্কার সর্ম্পকে নিশ্চিত হন। কিন্তু ১৮১৫ মতান্তরে ১৮২৩ সালে রবার্ট ব্রুস সদিয়ার সিঙ্গফো উপজাতীয়রা পানীয় হিসেবে চা ব্যবহার করছে জানতে পারেন এবং তাদের কাছ থেকে চা বীজ ও পাতা সংগ্রহ করে ডেভিড স্কটের কাছে পাঠান, স্কট তা নিজের বাগানে রোপণ করেন এবং পরবর্তীতে ১৮২৫ সালে তিনি চা বীজ ও পাতা পাঠান কিন্তু ওয়ালিচ নিশ্চিত হতে পারেননি যে এগুলো চা গাছের বীজ ও পাতা। শুধু তাই নয় ১৭৭৮ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুরোধে স্যার জোসেফ ভারতে চা চাষের সম্ভাবনা যাচাই করে ইতিবাচক মতামতও দিয়েছিলেন। এ থেকে প্রমাণীত হয় যে চা গাছ ভারতের এই অঞ্চলে নতুন নয়, বরং পূর্ব থেকেই ছিল। তবে তার অনেক পরে ১৮৩৪ সালে চা কমিটি ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে চা চাষের সুপারিশ করে।[২] এবং তার পর থেকে চা চাষের বিস্তার শুরু হয়। তবে চা কমিটির শুপারিশ প্রকাশিত হবার পূর্বেই চীন থেকে চা বীজ ও চা চাষে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে এসে আসাম, মুসৌরী ও মাদ্রাজে অঞ্চলে চা আবাদ শুরু করা হয়েছিল।

মুনাফার অংক স্বভাবতই ইউরোপীয়দেরকে চা চাষে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। অবশ্য নীল চাষে ভারতীয়দের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং আমেরিকায় দাস ব্যবসার মন্দাবস্থাও চা চাষে ব্যাপকভাবে পুঁজি বিনিয়োগের অন্যতম কারণ। গ্রিফিথের বিবরণ অনুযায়ী ১৮৬০ থেকে ১৮৬৫ সালে চা আবাদের জমির পরিমাণ ৭১৬ একর থেকে বেড়ে ১৯৩১ একর এবং মোট উৎপাদন ১,১৮,৯৪৯ পাউন্ড তেকে বেড়ে ৩,২৭,০৫০ পাউন্ড-এ দাঁড়ায়, মুনাফার হার ১১ শতাংম থেকে বেড়ে ৩৪ শতাংশে দাঁড়ায়। মুনাফার এই উর্ধ্বগতি ইউরোপীয়দের পাশাপাশি ভারতীয় জমিদার ও মহারাজাদেরকে পুঁজি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে। পাহাড় অঞ্চলের জমি "পতিত জমি" হিসেবে চা-করদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়ায় এবং সেই সাথে খাদ্যাভাব ও গিরিমিটে আবদ্ধ পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের সস্তা শ্রম চা-করদের পুঁজিকে স্ফীত করতে থাকে এবং সেই সাথে চা আবাদের ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পেতে থাকে (টেবিল-১ ও ২)।

টেবিল: ১ দার্জিলিং: চা-বাগান, আবাদী জমি ও চায়ের উৎপাদন, ১৮৭৪-১৯০৫

বৎসর	বাগানের সংখ্যা	আবাদী জমি (একর)	উৎপাদন (পাউন্ড)
১৮৭৪	১১৩	১৮,৮৮৮	৩৯,২৭,৯১১
১৮৮৫	১৭৫	৩৮,৪৯৯	৯০,৯০,২৯৮
১৮৯৫	১৮৬	৪৮,৬৯২	১,১৭,১৪,৫৫১
১৯০৫	১৪৮	৫০,৬১৭	১,২৪,৪৭,৪৭১

সূত্র : দূর্গা প্রসাদ ভট্টাচার্য, চা-বাগিচা : কিছু তথ্য, কিছু ইতিবৃত্ত, *লোকশ্রুতি*,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, বিশেষ সংখ্যা মার্চ ১৯৯২, পৃ:১৬।

টেবিল: ২ জলপাইগুড়ি: চা-বাগান, আবাদী জমি ও চায়ের উৎপাদন, ১৮৭৬-১৯০৭

বৎসর	বাগানের সংখ্যা	আবাদী জমি (একর)	উৎপাদন (পাউন্ড)
১৮৭৬	১৩	৮১৮	২৯,৫২০
১৮৮১	৫৫	৬,২৩০	১০,২৭,১১৬
১৮৯২	১৮২	৩৮,৫৮৩	১,৮২,৭৮,৬২৮
১৯০১	২৩৫	৭৬,৪০৩	৩,১০,৮৭,৫৩৭
১৯০৭	১৮০	৮১,৩৩৮	৪,৫১,৯৬,৮৯৪

সূত্র : দূর্গা প্রসাদ ভট্টাচার্য, চা-বাগিচা : কিছু তথ্য, কিছু ইতিবৃত্ত, *লোকশ্রুতি*,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, বিশেষ সংখ্যা মার্চ ১৯৯২, পৃ:১৭।

বাংলাদেশের চা শিল্প : ইতিহাসের উত্তরাধিকার

এদেশে চা আবাদের সূচনা ঘটেছিল আসামে আবাদ শুরু করার পরপরই যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে চা আবাদ শুরু করার বহু কাল পূর্ব থেকেই এ দেশীয় টিপরা জাতিগোষ্ঠীতে চা পানের প্রচলন ছিল। তারা মূলত ভেজা পাতা পানিতে ভিজিয়ে এক ধরনের দ্রবণ তৈরি করে পান করতো। তবে প্রচলিত অর্থে এদেশে চা এর সন্ধান মেলে ১৮৫৫ সালে সিলেটের করিমগঞ্জ অথবা শিলচরে, মুহম্মদ ওয়ারিস নামে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোন এক সাহেবের বাবুর্চি বাড়ীতে এসে মায়ের ঔষধের জন্য লতা-পাতা খুঁজতে গিয়ে এমন একটি পাতার সন্ধান পায় যে পাতার ঘ্রাণ সাহেবের চা পাতার ঘ্রাণের মতো। বাড়ি থেকে ছুটি শেষে যাবার সময়ে মুহম্মদ ওয়ারিস এ গাছের কিছূ পাতা নিয়ে যায়, কোম্পানীর সাহেব বিষয়টি তার সহকর্মীদের জানালে তারা তা' রয়েল কমিশনকে জানাতে বলে। রয়েল কমিশন বিষয়টি জানতে পেরে ছুটে আসে এবং নিশ্চিত হয় যে সিলেট অঞ্চলে চা চাষের সম্ভাবনা রয়েছে।

১৮৩৮ সালে সিলেটে ও কাছারে পরীক্ষামূলকভাবে চা আবাদ শুরু হয় এবং এর পর পর ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে চা চাষ শুরু হয়েছিল। সিলেটের মালনী ছড়ায় ১৮৫৪ সালে ডানকান ব্রাদার্স নামের বৃটিশ কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবে চা বাগান গড়ে তোলে। সরকারের কাছ থেকে ফি-সিম্পল-গ্রান্ট এবং সিলেটের কিছু জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় জমিদারদের কাছ থেকে বৃটিশ কোম্পানীগুলো চা আবাদ শুরু করে। ১৮৭৩ সালে সিলেটে ১৫,২৪০ একর জমি চাষের জন্য নেয়া হয়েছিল, এর মধ্যে ৩,২৪০ একর জমিতে চাষ করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৮২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে সিলেটের ৩,৬৬২ একর এবং চট্টগ্রামের ১,২০৩ একর জমিতে চা চাষ করা হতো। ১৮৮৬ সালে মৌলবী মাহাম্মদ আহাম্মদ তাঁর "শ্রীহট্ট দর্পণ" এ উল্লেখ করেন যে সিলেটের ১৬,৮৬১ একর জমিতে ১০৯টি বাগানে চা আাবাদ করা হতো। মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে বাগানের সংখ্যা ১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৯টিতে উপনীত হয় এবং চা চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ৪ গুন বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ সালে সিলেটে বাগানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৫টিতে এবং চট্টগ্রামে ২৫টিতে। অর্থাৎ ২০ বৎসরের মধ্যে বাগানের সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। যখন বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে তখন দেখা যায় চা চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ৪ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ হাজার একর এ উন্নীত হয়েছে।[৩]

প্রথম দিকে ইংরেজ অথবা বৃটিশ কোম্পানীগুলো একচেটিয়া চা বাগান গড়ে তুলতে গিয়ে প্রায় সমস্ত জমিই চা চাষের জন্য বন্দোবস্ত নিয়ে নিয়েছে তখন চা চাষের মুনাফা দেশীয় জমিদার ও ভূস্বামীদেরকে চা চাষে আকৃষ্ট করে। সিলেট অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোক শ্রেণী চা শিল্পে পুজিঁ বিনিয়োগ করেন। তবে দেশী মালিকানায় চা বাগানের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৯২৯ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সিলেটের চা চাষের ৯০ শতাংশ জমি বিদেশীদের মালিকানায় এবং মাত্র ১০ শতাংশ জমি ছিলো দেশী মালিকানায়।[৪] ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলে কিছু কিছু ইউরোপীয় তাদের বাগান বিক্রি করে চলে যায়, এদের বিক্রি করে দেয়া অধিকাংশ বাগান ক্রয় করে হিন্দু ব্যবসায়ীরা, পরবর্তীতে কিছু কিছূ বাগান মুসলমানরাও ক্রয় করে। ভারত বিভক্তির পর দেখা যায় যে, পাকিস্তানের ১২৮টি বাগানের মধ্যে ৩৫টি বৃটিশ, ৩৩ টি ভারতীয়, ১৪টি পাকিস্তানী হিন্দু এবং ৪৬টি বাগানের মালিক ছিল পাকিস্তানী মুসলমান। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ এর স্বাধীনতা লাভের পর পর চা বাগনের মালিকানারও কিছু বদল ঘটে। বর্তমানে বাংলাদেশে চা চাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ ১১৩,৮৬৩.৬২ একর এবং বাগানের সংখ্যা ১৫৬টি । চা বাগানের ৯০ শতাংশই সিলেটে অবস্থিত, ১৫৬টি চা বাগানের মধ্যে ১৩২টি সিলেটে এবং অবশিষ্ট ২৩টি বাগান মৌলভি বাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত।[৫] বৃটিশ কোম্পানী জেমস্ ফিনলে, ডানকান ব্রাদার্স এবং দেউন্দি ২৬টি বাগানের মালিক, ১৫টি বাগান সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং ৫২টি বাগান ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

টেবিল: ৩ বাংলাদেশে মালিকানা ভিত্তিক চা বাগানের বিবরণ

মালিকানার বিবরণ	মালিকানার ধরন	বাগানের সংখ্যা	ফাঁড়ি বাগানের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
জেমস্ ফিনলে কোং	বৃটিশ মালিকানধীন	৮	২৫	৩৩
ডানকান ব্রাদার্স	বৃটিশ মালিকানধীন	১৫	২১	৩৬
দেউন্দি টি কোং	বৃটিশ মালিকানধীন	৩	৩	৬
ন্যাশনাল টি কোং	সরকারি মালিকানধীন	১২	৭	১৯
বাংলাদেশ টি বোর্ড	সরকারি মালিকানধীন	৩	২	৫
	ব্যক্তিগত মালিকানাধীন	১১৭	২৪	১৪১

সূত্র: Thirty Successful Years for the Bangladesh Tea Industries, Tea & Coffee Asia, Vol. 4 No. 1, February-March-April 2002.

চা বাগান ও জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কুলীর পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৮৮৬ সালে চা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৭৪৭৭ জন আর বর্তমানে চা শ্রমিকের সংখ্যা ১,১১০৯১ জন। চা বাগানের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি যেখানে মালিকশ্রেণীর সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়, কুলীর সংখ্যা বৃদ্ধি সেখানে একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের পশ্চাৎপদতা ও বঞ্চনার ইঙ্গিত দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে, রাষ্ট্রের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে এবং প্রায়শই সরকারের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু চা শ্রমিকদের জীবনাচার ও তাদের প্রতি ম্যানেজমেন্টের আচরণের খোলস পরিবর্তন হলেও মূল থেকে বিচ্যুত হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না।

খ. চা বাগানের প্রশাসন: চন্ডীছড়া চা বাগান একটি কেইস ষ্টাডি

চা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পুরো প্রক্রিয়াটি চা বাগানেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ বাগান থেকে চা প্যাকেটজাত হয়ে সরাসরি মার্কেটে চলে যায়। চা গাছ বপন থেকে শুরু করে চা প্যাকেটজাতকরণ পর্যন্ত সকল কাজই একটি সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক

কাঠামোয় সম্পন্ন হয়। যেখানে পদমর্যাদা, পদসোপান, নিয়ন্ত্রণের সীমা, শ্রম বিভাজনের মতো আধুনিক সংগঠনের উপাদানগুলি বিদ্যমান থাকলেও এর প্রশাসনিক সংস্কৃতি অন্য যে কোন সংগঠন থেকে ভিন্ন।

আবাদের সূচনাকাল থেকে ১৮৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত চা উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থাটিই ছিল মানুষ নির্ভর, চা বীজ বপন থেকে শুরু করে হাতে তুলা পাতা শুকানো, পেষানো এবং প্যাকেটজাতকরণের মতো সকল কাজই হাতে করা হতো। ক্রমান্বয়ে চা প্রক্রিয়াজাতকরণে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। যন্ত্রের ব্যবহার সংস্কৃতিগত পরিবর্তন না আনলেও কাঠামোগত পরিবর্তন আনে, সাধারণ অফিস, ফিল্ড অফিস ও বাগান এই তিনভাগে বাগানের কর্মকাণ্ড বিভক্ত হয়ে নতুনভাবে কাজের বিন্যাস ঘটে।

বাগান পরিচালনায় বা কর্মী ব্যবস্থাপনায় পদসোপান নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। বাগান প্রশাসন সুনির্দিষ্ট কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করে এবং ম্যানেজার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাগানের সর্বময় ক্ষমতা ম্যানেজারের হাতে ন্যস্ত, তিনি সকলের কাজের তদারকী ও মূল্যায়ন এবং শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বাগানের উৎপাদন কর্মসূচি বা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা থেকে শুরু করে বাগানে শ্রমিকদের বিরোধের মিমাংসা পর্যন্ত করে থাকেন।

ম্যানেজার দুইজন এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের সহায়তায় বাগানে প্লান্টেশেন ও চা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গুদামজাতকরণ এবং পরিবহনের কাজ পরিচালনা করে থাকেন। দুইজন এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের মধ্যে একজন বাগানের দায়িত্বে এবং অপরজন ফ্যাক্টরীর দায়িত্বে থাকেন। প্রত্যেকের অধীনে বাবু-ষ্টাফ, সাব-ষ্টাফ ও শ্রমিকরা কাজ করে। ম্যানেজাররা শ্রমিকদেরকে সরাসরি কোন কাজের জন্য নির্দেশ প্রদান না করে বাবু-ষ্টাফদের মাধ্যমে তাদের পরিচালিত করে থাকেন।

বাগানের সকল কর্মকাণ্ড বাগান অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মূল অফিস পরিচালনার দায়িত্ব ম্যানেজারের, তিনি বাবু-ষ্টাফ ও সাব-ষ্টাফদের নিয়ে এই অফিস পরিচালনা করেন। ম্যানেজার-এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে একজন হেডক্লার্ক, একজন সেকেন্ড ক্লার্ক, টাইপিষ্ট ও একজন থার্ড ক্লার্ক বাগানের মূল অফিসের কাজ করে থাকে। বাগানে শ্রমিকদের মজুরী ও ষ্টাফদের বেতন ও অন্যান্য আর্থিক হিসাব পত্র দেখবার কাজটি করেন হেডক্লার্ক বা কেরানি বাবু, চিঠিপত্র লেখা, নথিবদ্ধ করা ও অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ করবার জন্য যারা রয়েছেন তাদের সকলেই বাগানে বাবু-ষ্টাফ নামে পরিচিত, বাগানে তারা দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছেন, সাধারণত তাদের বদলি করা হয় না। চন্ডীছড়া বাগানের হেডক্লার্ক, টিলা বাবু, ফ্যাক্টরী-বাবু ও গুদাম-বাবুদের ১৫ জনেরই বাবা কিংবা অন্য কোন নিকটাত্মীয় বাগানে বাবুশ্রেণীর স্টাফ ছিলেন। বাগানের বর্তমান ম্যানেজার ও এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারদের কোন নিকটাত্মীয় বাগানে ছিলেন না। বাবু-ষ্টাফরা পূর্ব থেকেই বাগানের পরিবেশের সাথে পরিচিত হলেও এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজাররা এক্ষেত্রে নতুন। ম্যানেজার ও এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারদের বাগানে সাহেব নামে সম্বোধন করা হয়।

চন্ডীছড়া চা বাগানে ম্যানেজারের অধীনে দু'জন এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার রয়েছেন যারা ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন। ম্যানেজার, সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট

ম্যানেজার ও এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের কাজের অভিজ্ঞতা যথাক্রমে ১৯ বৎসর, ৯ বৎসর এবং ২ বছর। ম্যানেজার ও ১ জন এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী করেছেন এবং অপর এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার স্নাতক পাশ।

দুইজন এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের মধ্যে একজন বাগান তথা ফিল্ডের দায়িত্ব এবং অপরজন ফ্যাক্টরী ও গুদামের দায়িত্ব পালন করেন। বাগানে প্লান্টেশেন, চা গাছ রক্ষণাবেক্ষণ ও পাতা চয়নের যাবতীয় কাজ ১ জন করে হেড টিলা বাবু ও সেকেন্ড টিলা বাবু, ৪ জন থার্ড টিলা বাবু ও ১ জন শিক্ষানবিশ এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী করে থাকেন। সমগ্র চন্ডীছড়া বাগানটি ২৩টি বিভিন্ন সেকশনে বিভক্ত, সেকশনে শ্রমিকদের কাজ বণ্টন, তদারকী করা, দৈনিক তিনবেলা পাতার ওজন নেয়া ও সপ্তাহান্তে মজুরী বণ্টনের মতো কাজগুলো টিলা বাবুরা এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের নির্দেশমতো করে থাকেন। এই এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে গুদাম বিভাগ, গুদাম বিভাগ ১ জন হেড স্টোর বাবু ও ১ জন সেকেন্ড স্টোর বাবু এবং দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ১ জন বা ততোধিক শ্রমিক স্টোরের যাবতীয় কাজ করে থাকে।

ফ্যাক্টরীর দায়িত্ব একজন এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের কাছে ন্যস্ত থাকলেও ম্যানেজার তাঁর কর্মদিবসের একটা সময় ফ্যাক্টরীতে থেকে কাজ তদারকী করে। ফ্যাক্টরীর দায়িত্ব যে এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের তাকে ফ্যাক্টরী সাহেব বলা হয়ে থাকে। ফ্যাক্টরী সাহেবের নিয়ন্ত্রণে ১ জন হেড ফ্যাক্টরী-বাবু ও ১ জন সেকেন্ড ফ্যাক্টরী-বাবু , ২ জন থার্ড ফ্যাক্টরী-বাবু সহ কয়েকজন সাব-ষ্টাফ যেমন ৩ জন ফিটার, ১ জন হেড টার্ণার ও এ্যাসিস্টেন্ট টার্ণার এবং ৪৮জন শ্রমিক প্রতি ৮ ঘন্টার শিফটে ফ্যাক্টরিতে চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকিং ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো কাজগুলো করে থাকে। ১ জন ট্রান্সপোর্ট মেকানিক ও দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ২ জন শ্রমিক ট্রান্সপোর্ট বিভাগে ও ১ জন কাঠমিস্ত্রি ও দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে তার সহকারী হিসেবে ৪ জন শ্রমিক কার্পেন্টার বিভাগে ফ্যাক্টরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের অধীনে কাজ করেন। দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে যারা কাজ করে এদের সকলে সবসময় ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন এমন নয়, কখনো তারা বাগানে, কখনো সাহেবের বাংলোতে কাজ করেন।

চন্ডীছড়া বাগানের ফ্যাক্টরীতে কোন নারী শ্রমিক কাজ করেন না। বছর দুয়েক আগে সর্বশেষ নারী শ্রমিককে ফ্যাক্টরীর কাজ থেকে বদলী করে বাগানের কাজ দেয়া হয়েছে। ফ্যাক্টরীতে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ চলে, রাতে নারীদের বাড়ী ফিরা সবসময় নিরাপদ নয়, এমনকি নারী শ্রমিক ফ্যাক্টরীতেও যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে, বাগানে খোলামেলা জায়গায় এবং দিনের আলোয় কাজ করতে হয় বলে এই ভয় থাকে না। এছাড়া নারী শ্রমিক কাজ শেষে বাড়ী ফিরবার সময়ে পুরুষদের তুলনায় খুব সহজেই চা চুরি করতে পারে এটিও নারী শ্রমিককে ফ্যাক্টরীতে কাজ না দেয়ার অন্যতম কারণ।

টেবিল : ৪ চন্ডীছড়া চা বাগানের কর্মী বিভাজন

অফিস পদ/ধরন	ষ্টাফ সংখ্যা	বাগান পদ/ধরন	ষ্টাফ সংখ্যা	ফ্যাক্টরী পদ/ধরন	ষ্টাফ সংখ্যা
হেড ক্লার্ক	১	হেড টিলা ক্লার্ক	১	হেড ফ্যাক্টরী ক্লার্ক	১
সেকেন্ড ক্লার্ক	১	সেকেন্ড টিলা ক্লার্ক	১	সেকেন্ড ফ্যাক্টরী ক্লার্ক	১
থার্ড ক্লার্ক	১	থার্ড টিলা ক্লার্ক	৪	থার্ড ফ্যাক্টরী ক্লার্ক	২
টাইপিষ্ট	২	শিক্ষানবিশ	১	ফিটার	৩
হেড স্টোর ক্লার্ক	১	-	-	-	-
এ্যাসিষ্টেন্ট স্টোর ক্লার্ক	১	-	-	-	-
মোট	৭		৭		৭

অন্যান্য বাগানের মতো চন্ডীছড়া বাগানেও মেডিকেল সেন্টার পরিচালনার জন্য ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার পদ মর্যাদায় একজন ডাক্তারের স্থায়ী পদ রয়েছে। ডাক্তারের অধীনে এক বা একাধিক কম্পাউন্ডার, ধাত্রী, ড্রেসার এবং ওয়ার্ডবয় কাজ করেন। গবেষণাধীন বাগানে বর্তমানে সার্বক্ষণিক ডাক্তার নেই, থানা সদর থেকে সপ্তাহে দুই দিন এসে একজন ডাক্তার রুগী দেখে যান, ডাক্তারের অবর্তমানে দুই জন কম্পাউন্ডার রয়েছেন যারা সাধারণ চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। একজন ড্রেসার ও দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে পাঁচজন ওয়ার্কার ওয়ার্ডবয়ের কাজ করে।

শ্রমিকদের ধরন : বাগান দফা - বস্তি দফা

গবেষণাধীন বাগানসহ সকল বাগানেই চা শ্রমিকদের কাজের স্থায়িত্ব ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একদল বাগান-দফা অপরদল বস্তি-দফা। শ্রমিকদের যারা স্থায়ী তাদের বলা হয় বাগান-দফা আর যারা অস্থায়ী তাদের বস্তি-দফা বলা হয়ে থাকে। স্থায়ী শ্রমিকরা যে হারে মজুরী পায় অস্থায়ী শ্রমিকরা তার চেয়ে কম মজুরীতে কাজ করে। বাড়ী, বোনাস, ছুটি, চাষের জমি ও চিকিৎসার মতো যে সকল সুযোগ সুবিধা সুবিধা বাগান দফার শ্রমিকরা পেয়ে থাকে বস্তি দফার শ্রমিকরা তা' পায় না। তবে গবেষণাধীন বাগানে দেখা গেছে যে, চিকিৎসা সুবিধা সকলেই পায়, যে ঔষধ দেয়ার প্রয়োজন হয় তা ঐ শ্রমিকের নামে দেয়া যাবে না বিধায় তাঁর পরিবারের স্থায়ী কোন শ্রমিকের নামে দেয়া হয়। একইভাবে বাগান দফার শ্রমিকরা যে বাড়ী পায় তাতেই বস্তি-দফার শ্রমিক থাকে কেননা প্রতি পরিবারের ন্যূনতম একজন সদস্য স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রেও পরিবারের কেউ না কেউ স্থায়ী হতে পারে, ইতিপূর্বে পরিবারের কোন সদস্য স্থায়ী কাজ করলে তার অবসরের পর তার কাজটা পরিবারের অন্য কারো নামে করিয়ে তারা বাগানে বাস করে আসছে। বাগানে শ্রমিকরা তিন ভাবে কাজে স্থায়ী হয়ে থাকে, প্রথমত দীর্ঘদিন যাবৎ অস্থায়ী ভাবে বস্তি-দফায় কাজ করার পর তার কাজের পারফরমেন্স মূল্যায়নের ভিত্তিতে, পরিবারের কোন সদস্য কাজ থেকে অবসর নেয়ার পর তার পরিবর্তে কাজে যোগ দেয়া এবং দস্তর প্রথার মাধ্যমে।

দস্তর প্রথা বাগানে চাকুরী স্থায়ীকরণের একটি ভিন্ন প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে সাধারণত ম্যানেজার বা ম্যানেজমেন্টের পদস্থ কারো সুপারিশ কাজ করে। বিষয়টি এ রকম হয়ে থাকে, কোন সাহেবের বাসায় কাজ করতো অথবা তিনি তার কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু তাঁর সময়ে স্থায়ীকরণের সুযোগ ছিল না এরকম ক্ষেত্রে তিনি পরিবর্তী ম্যানেজারের কাছে সুপারিশ করে

যান অথবা ঐ শ্রমিকের একটি আবেদনে সুপারিশ করে যান, যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে ঐ শ্রমিক পরবর্তী ম্যানেজার অথবা তার পরের জনের কাছে তদবির করে নিজের চাকরি স্থায়ী করিয়ে নেন।

গবেষণাধীন চন্ডীছড়া বাগানে ১০০ জন বাগান-দফা শ্রমিকের মধ্যে দেখা গেছে যে ১৪ জন নারী শ্রমিক সরাসরি বাগান-দফা শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছেন তার শ্বশুর ও শাশুড়ীর কাজ থেকে অবসর নেয়ার পরে তাদের পরিবর্তে, ৬ জন তার স্বামীর কাজের পরিবর্তে, এর মধ্যে ২ জনের স্বামী বাগানের বাইরে কাজে যায় এবং ৪ জনের স্বামী মারা গিয়েছেন। নিজের বাবা-মায়ের পরিবর্তে কাজে স্থায়ী হয়েছেন এরকম নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৫ জন। প্রচলিত নিয়মে অর্থাৎ বস্তিদফা হিসেবে কাজ করতে করতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে স্থায়ী হয়েছেন ২৫ জন নারী শ্রমিক। ২৭ জন পুরুষ শ্রমিক স্থায়ী হয়েছেন তার বাবার কাজের পরিবর্তে এবং ৭ জন স্থায়ী হয়েছেন মায়ের পরিবর্তে, ১৫ জন স্থায়ী হয়েছেন প্রচলিত নিয়মে এবং অবশিষ্ট ১জন স্থায়ী হয়েছেন দস্তুর অনুযায়ী।

বেতন/মজুরী

চা বাগানের স্থায়ী ষ্টাফদের মাস শেষে নির্দিষ্ট স্কেলে প্রদান করা হয় বেতন, আর শ্রমিক স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী যাই হোক না কেন, তাদের প্রদান করা হয় মজুরী। সপ্তাহান্তে বিকালে শ্রমিকরা লাইন ধরে মজুরীর টাকা নিতে আসে, বাবু ষ্টাফরা তাদের যে দিন এই মজুরীর টাকা প্রদান করে থাকে সেদিনকে তারা *তলবি* দিন বলে থাকে। চা বাগানের ষ্টাফদের অর্থাৎ স্থায়ী কর্মীদের বেতন নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ চা সংসদ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই বেতন স্কেলের পরিবর্তন করে থাকে। ম্যানেজারদের জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র বেতন স্কেল। বাগানে চা উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ শ্রমিকদের মজুরী প্রদান করা হয় দৈনিক ভিত্তিতে, মাসিক ভিত্তিতে স্বল্প কয়েকজন ড্রাইভার, মেকানিক, কার্পেন্টারের বেতন প্রদান করা হয। শ্রমিকদের বেতন দেশের দৈনিক খেটে খাওয়া মজুরদের তুলনায় খুবই কম। বৃটিশ আমলে পুরুষ শ্রমিকরা মাসে ৬ টাকা, নারী শ্রমিকরা মাসে সারে ৪ টাকা মজুরী পেতেন আর কিশোরদের ৩ থেকে ২ টাকা মজুরী দেয়া হতো। মজুরী ছাড়াও তারা চাল, ডাল, গুড় আর লবন রেশন পেতেন। কিন্তু এই মাহিনা দিয়ে তাদের দিনাতিপাত ঘটতো না, সর্দার আর শাইলক নামে পরিচিত মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে হতো। বর্তমানে চা বাগান মালিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ চা সংসদ' এর সাথে চা শ্রমিকদের সংগঠন ' বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন' এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারণ করে তা' কঠোরভাবে মনিটরিং করা হয়। সিলেট ও চট্টগ্রামের চা বাগানগুলিকে বাৎসরিক উৎপাদনের ভিত্তিতে আলাদা আলাদাভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা করে পৃথক পৃথকভাবে মজুরী নির্ধারণ করে থাকে। ২০০২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হতে কার্যকর নতুন চুক্তি মোতাবেক সিলেট ও চট্টগ্রামের তিন ক্যাটাগরীর বাগানের পুরুষ ও নারী শ্রমিকরা একই হারে সর্বোচ্চ ২৮ টাকা এবং কিশোর-কিশোরী ও বালক-বালিকা শ্রমিকরা যথাক্রমে সর্বোচ্চ ২৭.৩০ ও ২৫.৪৫ টাকা দৈনিক হারে মজুরী পেয়ে থাকেন। যোগালী সর্দার ও চৌকিদাররা একই হারে মজুরী পায় এবং সেই সাথে তারা মাসিক ৩৯ টাকা অতিরিক্ত পেয়ে থাকেন। দৈনিক মজুরী ছাড়া একজন স্থায়ী শ্রমিক তার পরিবারে স্ত্রী ও সর্বোচ্চ ৩জন নির্ভরশীল সন্তানের জন্য রেশন হিসেবে আটা পেয়ে থাকেন। সপ্তাহে ১ জন শ্রমিক ও তার স্ত্রী প্রত্যেকে ৩.৫ কেজি, ৮-১২ বয়সী সন্তানের জন্য ২.৫০ কেজি এবং ৮

বছরের নিচে হলে ১.২৫ কেজি হিসেবে রেশন পেয়ে থাকেন। বাড়ী, চিকিৎসা, বাড়ী মেরামত, চিকিৎসা, ছুটি, রেশন সাবসিডি ও বোনাসসহ একজন স্থায়ী শ্রমিক প্রতিদিন গড়ে ৫১.২৫ টাকা পেয়ে থাকেন, যদি শ্রমিকরা বৎসরে অন্তত ২৯৮দিন কাজ করেন।

দৈনিক মজুরী নির্ধারণের সাথে সাথে শ্রমিকদের কাজের নিরিখও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, একজন শ্রমিককে পূর্ণ মজুরী পাবার জন্য দৈনিক কমপক্ষে ২৩ কেজি পাতা তুলতে হয়, নিরিখ অনুযায়ী পাতা তুলবার পর অতিরিক্ত প্রতি কেজি পাতা তুলবার জন্য ৭৫ পয়সা করে মজুরী দেয়া হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে যে অতিরিক্ত পাতা তুলা হয় তাকে *দেরিয়া* বলা হয়। গবেষণাধীন বাগানে দেখা গেছে যে, মৌসুমে (এপ্রিল থেকে জুন) একজন শ্রমিক দৈনিক ৯-১১ কেজি অতিরিক্ত পাতা তুলতে পারে। পাতা চয়নের জন্য যেমন নিরিখ বেঁধে দেয়া আছে তেমনি অন্যান্য কাজের জন্যও নিরিখ বেঁধে দেয়া আছে। এই নিরিখকে পরিমাপ করা হয় *নল* নামের এককে, এক নল সমান আট হাত, অন্যান্য কাজকে পরিমাপ করা হয় ভিন্নভাবে, যেমন- বাগানে সার দেয়ার কাজকে বস্তা হিসেবে পরিমাপ করা হয়। বাগানের এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারগণ প্রতিদিন কাজের ধরন ও নিরিখ ঠিক করে দিয়ে বাবু-ষ্টাফদের জানিয়ে দেন, তারপর বাবু ষ্টাফরা শ্রমিকদের কাজের নির্দেশ ও কোথায় করতে হবে জানিয়ে দেয়। কাজ শেষে কাজের পরিমাপ করে বাবু ষ্টাফ শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী খাতায় তুলে রাখে, তারপর নির্ধারিত দিনে মজুরী পরিশোধ করা হয়।

চন্ডীছড়া চা বাগানের সাপ্তাহিক মজুরী বা *তলবী* বৃহস্পতিবার বিকেলে দেয়া হয়। বাবুষ্টাফরা উম্মুক্ত মাঠের নির্ধারিত একটি জায়গায় খাতাপত্র নিয়ে বসেন, শ্রমিকরা লাইন দিয়ে সেখান থেকে তাদের সপ্তাহের মজুরী নিয়ে যান। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে চন্ডীছড়া চা বাগানে একজন স্থায়ী শ্রমিক সপ্তাহে গড়ে সর্বোচ্চ ২৬১ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৮০.৪০ পয়সা মজুরী পেয়েছেন, তবে ১৬০ টাকা মজুরী পেয়েছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা ৪৯%। ১৬৫ টাকা থেকে ১৮০ টাকা, ১৫০ টাকা থেকে ১৬৫ টাকা, ১৩৫-১৪৯ টাকা, ১২০ টাকা থেকে ১৩৪ টাকা মজুরী পেয়েছেন পেয়েছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩%, ২১%, ৮% এবং ৭%। ১২০ টাকার কম মজুরী পেয়েছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা ২%। পাতা চয়নের বাইরে বাগানের অন্যান্য কাজ করেন এমন শ্রমিকের নির্ধারিত দৈনিক মজুরীর অতিরিক্ত মজুরী পাবার সুযোগ খুবই সীমিত। আর অস্থায়ী শ্রমিকদের সাপ্তাহিক আয় তার চেয়েও কম, একজন অস্থায়ী শ্রমিক প্রতিদিন ২০ টাকা মজুরী পান, আর যারা পাতা চয়ন করে তারা কেজি প্রতি ১ টাকা হারে পেয়ে থাকেন।

টেবিল:৫ চন্ডীছড়া চা বাগানের শ্রমিক পরিসংখ্যান

বছর	বিবরণ	পুরুষ	নারী	কিশোর-কিশোরী	শিশু	মোট
	স্থায়ী শ্রমিক	৩০৮	৩২০	২৬০	৫৫	৯৪৩
	অস্থায়ী শ্রমিক	২৭০	২৩৫	-	-	৫০৫
	নির্ভরশীল	৫৮	৫৪	৭৯১	৭০৮	১৬১১
১৯৯৩	স্থায়ী শ্রমিক	৩২৩	৩৩৬	২৫০	৩৫	৯৪৪
	অস্থায়ী শ্রমিক	২৫০	২৮০	-	-	৫৩০
	নির্ভরশীল	৬৫	৬০	৭৬০	৯০৪	১৭৮৯
১৯৯৪	স্থায়ী শ্রমিক	৩৪২	৩৪৫	২৪১	১৬	৯৪৪
	অস্থায়ী শ্রমিক	৩০০	৩৭০	-	-	৬৭০
	নির্ভরশীল	-	-	৮০০	১০০০	১৮০০
১৯৯৫	স্থায়ী শ্রমিক	৩৬১	৩৫৬	২২১	৬	৯৪৪
	অস্থায়ী শ্রমিক	৩৫০	৪০০	-	-	৭৫০
	নির্ভরশীল	-	-	১০০০	১২০০	২২০০
১৯৯৬	স্থায়ী শ্রমিক	৩৭০	৩৭৭	১৯২	০৬	৯৪৫
	অস্থায়ী শ্রমিক	৩৫০	৪০০	-	-	৭৫০
	নির্ভরশীল	-	-	১০০০	১২০০	২২০০
১৯৯৭	স্থায়ী শ্রমিক	৩৭৭	৩৭৭	১৯৩	-	৯৪৭
	অস্থায়ী শ্রমিক	৩৬৭	৩৮১	-	-	৭৪৮
	নির্ভরশীল	-	-	১২২৬	৯৯০	২২১৬
১৯৯৮	স্থায়ী শ্রমিক	৩৭৯	৩৮৩	১৮৬	-	৯৪৮
	অস্থায়ী শ্রমিক	৩৮০	৪০০	-১১৮০	-	৭৮০
	নির্ভরশীল	-	-		১০৫০	২২৩০
১৯৯৯	স্থায়ী শ্রমিক	৩৯৬	৩৮৯	১৬৩	-	৯৪৮
	অস্থায়ী শ্রমিক	৪০৫	৪১৮	-	-	৮২৩
	নির্ভরশীল	-	-	১২৯১	১০৭৫	২২৬৬
২০০০	স্থায়ী শ্রমিক	৪১৪	৩৮৫	১৪৯	-	৯৪৮
	অস্থায়ী শ্রমিক	৪১১	৪২৪	-	-	৮৩৫
	নির্ভরশীল	-	-	১২৪০	১১৬০	২৪০০
২০০১	স্থায়ী শ্রমিক	৪৩৪	৩৯৯	১২১	-	৯৫৪
	অস্থায়ী শ্রমিক	৪৬০	৪৭৬	-	-	৯৩৬
	নির্ভরশীল	-	-	১২৬০	১০৯০	২৩৫০
২০০২	স্থায়ী শ্রমিক	৪২২	৩৭৯	১৫১	-	৯৫২
	অস্থায়ী শ্রমিক	৪৮০	৪৫০	-	-	৯৩০
	নির্ভরশীল	-	-	১০১০	১০৭০	২০৮০

উৎস: চন্ডীছড়া বাগানের বাবুষ্টাফদের সহায়তায় গবেষক কর্তৃক প্রস্তুত

বাগানে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিকদের আয় তুলনামূলক ভাবে বেশি, কারণ অধিকাংশ নারী শ্রমিক পাতা চয়নের কাজ করে, আর পাতা চয়ন ছাড়া অন্যান্য কাজে অতিরিক্ত মজুরী পাবার সুযোগ প্রায় নেই। কিন্তু এখানেও শোষণের কথা শুনা যায়, পুরো

বাগানটি কয়েকটি এলাকা বা টিলায় বিভক্ত, পাতা তুলবার পর মেপে হিসাব রাখার কাজটি করেন টিলা-বাবুরা। প্রতিটি টিলায় পাতা পরিমাপ করানো ও হিসাব রাখবার জন্য আলাদা আলাদা টিলা-বাবু থাকেন, টিলা-বাবু ওজনে কম দেখানোর চেষ্টা করে থাকেন এটি একটি প্রচলিত কথা, গবেষণাধীন বাগানে টিলা-বাবুর পাশে ওজন নেবার সময়ে এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলেও এখানকার নারী শ্রমিকেরা ওজনে কম দেখিয়ে টিলা-বাবুদের মজুরী চুরি করবার অভিযোগ করেছে । তারপরও তলবীর দিনে শ্রমিকরা খুবই উৎফুল্ল থাকে, এইদিন তারা বাগানের ভেতর নাচঘরের পার্শ্বে যে বাজার বসে সেখান থেকে, আবার কখনো কখনো চুনারুঘাট থেকেও বাজার করে, রাতে হারিয়া পান করে আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করে।

সকল সুবিধাসহ স্থায়ী শ্রমিকের দৈনিক প্রাপ্য মজুরী

সকল সুবিধাসহ দৈনিক ১জন স্থায়ী শ্রমিকের জন্য কর্তৃপক্ষের ব্যায়ের খাত:
দৈনিক ২৮ টাকা হিসেবে অন্যান্য সুবিধাসহ ২৮৯ দিনে

শ্রমিকের মজুরী: ২৮৯ × ২৮	= ৮০৯২/=
বোনাস :	= ৪৬০/=
মেডিক্যাল :	=৬৮৬/=
ছুটিতে থাকাকালীন প্রাপ্য মজুরী: ২৪ × ২৮	=৬৭২৫/=
ঘর মেরামত বাবত ব্যয়:	=১৩৩৭/=
রেশন সাবসিডি বাবত ব্যয় :	=৩৫৬৫/=
মোট :	=১৪৮১২/=

১ জন শ্রমিক বাবত কর্তৃপক্ষের দৈনিক ব্যয় ৫১.২৫ টাকা মাত্র।

শ্রমিকদের প্রেষণা

শ্রমিকদের চাহিদা ও প্রয়োজনের দাবী মিটিয়ে কাজে তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা আধুনিক প্রশাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিক সংগঠনে শ্রমিককে যন্ত্র হিসেবে না দেখে তার মানবিক চাহিদার পূরণ করে কাজে আগ্রহী করে তোলবার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য তাদেরকে প্রাপ্য মজুরীর বাইরেও বোনাস, পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি, বিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে। গবেষণাধীন বাগানের শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার থেকে গবেষকের কাছে এটিই প্রতীয়মান হয়েছে যে, তারা কর্তৃপক্ষের কিছু ভূমিকার জন্য কাজে উৎসাহ পায় না শুধু কাজে ফাঁকিও দিয়ে থাকে। অনুৎসাহের কারণসমূহের মধ্যে অপ্রতুল মজুরী, চিকিৎসা সুবিধা, দীর্ঘদিন যাবৎ অস্থায়ী হিসেবে কাজ করেও চাকুরি স্থায়ীকরণ না হওয়া অন্যতম।

আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সৎ ও কর্মঠ শ্রমিককে বোনাস, বেতন বৃদ্ধি বা অন্য কোন কিছু পুরস্কার হিসেবে দেয়া হলে শুধু তাদের কাজে আগ্রহই বাড়বে না, নিজেদের সম্মানিত মনে করে অন্যান্যদের কাজে উৎসাহিত করতে পারে বলে বয়স্ক শ্রমিকরা জানিয়েছেন। শ্রমিকদের সারা দিনের কাজের শেষে বিনোদন বা অবসর সময় কাটানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য কিছু কিছু উদ্যোগ নিয়ে থাকে, আবার ম্যানেজাররা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে সাহায্য বা উপহার হিসেবে অর্থ দিয়ে থাকে। বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বিনোদনের জন্য বাগানের মধ্যবর্তী জায়গায় মন্দিরের পাশেই

একটি নাচঘর তৈরী করে দিয়েছে, নাচঘর ও মন্দির সকল বাগানেই আবশ্যিকভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। নাচঘরে মাঝে মাঝে শ্রমিকদের পঞ্চায়েত নাচ বা অন্য কোন ধরনের যেমন যাত্রাপালা, কীর্তন ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। কোন শ্রমিক বা তার পরিবারের কোন সদস্য মারা গেলে তার দাহ করার জন্য শ্রমিকরা চাইলে ম্যানেজার জ্বালানী কাঠ দিয়ে থাকে।

গ. চা বাগানের প্রশাসনিক সংস্কৃতি

চা বাগানের প্রশাসকদের আচরণ ও ভূমিকার অন্য যে কোন সংগঠনের প্রশাসকদের থেকে ভিন্নতা রয়েছে। এখানকার প্রশাসকদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অধস্তনদের সাথে আচরণ কিংবা সর্ম্পকের ভিন্নতা এক ধরনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে। চা বাগানের প্রশাসনিক সংস্কৃতি অনুধাবন করতে হবে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কেননা সংস্কৃতি বিকশিত হয় যুগ যুগ ধরে এর বাহকদের হাত ধরে। প্রশাসনিক সংস্কৃতি হলো সংগঠনের সদস্যদের মূল্যবোধ ও বুঝাপড়ার সমষ্টি যার মধ্য দিয়ে সংগঠনের ও তার সদস্যদের আচরণ প্রভাবিত হয়ে থাকে।[১] সংগঠনের প্রচলিত বিধি নিষেধ, নিয়মানুবর্তিতা এর সাথে জড়িত ব্যক্তি মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা, ঐতিহাসিক বিবর্তন এর সবকিছু মিলিয়েই সৃষ্টি হয় ঐ সংগঠনের সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই তার সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, একের প্রতি অন্যের আচরণের চিত্র বুঝতে পারা সম্ভব।

শ্রমের ধরনের দিক থেকে এটি অন্যান্য শিল্প থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে এটি কৃষি ও যন্ত্র শিল্পের এমন একটি মিশ্রণ যেখানে শ্রমিকদের সার্বক্ষণিক উৎপাদন ক্ষেত্রে অবস্থান করতে হয়। শুধুমাত্র শ্রমিক নয় এর উৎপাদনের সাথে জড়িত সকলকেই বাগান এলাকায় থাকতে হয়, এদের জীবনযাপন প্রণালীও আলাদা, নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। চা বাগানের প্রশাসনিক সংস্কৃতি অনুধাবন করা যেতে পারে ম্যানেজমেন্ট, শ্রমিক ও মধ্যবর্তী বাবু-ষ্টাফদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রথা ইত্যাদি বিষয় থেকে। সেই সাথে প্রয়োজন উপমহাদেশে চা চাষের ঐতিহাসিক পটভূমির বিশ্লেষণ, কেননা সংস্কৃতি হলো মানুষের দীর্ঘদিনের কর্ম, প্রথা ও আচরণের ফল যা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

চা উৎপাদন ও বাগানের সকল দিক পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বরত ম্যানেজার, এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারদের চা শ্রমিক ও বাগানের অন্যান্য ষ্টাফরা এবং স্থানীয়রা যথাক্রমে শুধু বড় সাহেব ও ছোট সাহেব হিসেবেই জানে না, তাদের কাছে তারা সাক্ষাৎ প্রভু। বড় সাহেব ও ছোট সাহেবদের আদেশ-নির্দেশ শ্রমিকদের কাছে সাক্ষাৎ প্রভুর নির্দেশ যেন, বংশপরস্পরায় তারা সাহেবদের নির্দেশ মেনে চলে আসতে দেখেছেন, সাহেবদের আদেশ মেনে চলবে না এটা অবাস্তব ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নির্দেশ অমান্য করার ফল হিসেবে পূর্বের মতো এখন আর দৈহিক শাস্তি দেয়া না হলেও কাজ বন্ধ করে রাখা, অপেক্ষাকৃত কঠিন বা ভারি কাজ দেয়ার প্রথা রয়েছে। বৃটিশ প্রশাসকরা চা আবাদের শুরুতেই কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ, কাজে অবহেলা ইত্যাদি কারণে ভয়ংকর শাস্তি প্রদানের সংস্কৃতির তৈরী করেছিল। শ্রমিকদেরকে তারা চা উৎপাদনের জন্য যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে, তাদের কাছে শ্রমিকদের মানবিক মর্যাদা অথবা চাহিদার পরিবর্তে উৎপাদন আর মুনাফাই ছিল মুখ্য। ভয় আর শাস্তি দিয়ে শ্রমিকদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নিয়েছে।

জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও ম্যানেজাররা ঔপনিবেশিক কালের ব্যবস্থাপকদের আভিজাত্যকে বহন করে চলছে। ম্যানেজারের বাংলো বড় বাংলো, এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারের মধ্যে যিনি ফ্যাক্টরীর দায়িত্বে তার বাংলো ফ্যাক্টরী সাহেবের বাংলো এবং যিনি বাগানের দায়িত্বে তার

বাংলো বাগন সাহেবের বাংলো নামে পরিচিত, কখনো তাদের বাংলোকে ছোট সাহেবের বাংলো নামে ডাকা হয়। বাংলোগুলো শুধু পূর্বের অবয়বই ধরে রাখেনি, নিয়ম কানুনের দিক থেকেও অনেকটা পূর্বের মতো। পূর্বের মতো ম্যানেজারদের জৌলুস নেই, সুযোগ-সুবিধা কমে যাচ্ছে–এই কথাগুলো প্রায়ই শোনা গেছে ম্যানেজারদের মুখে। প্রাক গবেষণাধীন বাগানের ম্যানেজারের প্রায়ই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, শ্রমিকদেরকে তারা আর বেগার খাটান না, যখন ইচ্ছে তখনই ডেকে পাঠান না, খুব কমই বকা দিয়ে থাকেন, গায়ে হাত তোলার প্রশ্নই উঠে না- ঔপনিবেশিক কালের ব্যবস্থাপকরা এর সবই করতেন, তারা তা' করেন না এটি যেন তাদের উদারতা। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, পূর্বের অর্থাৎ সাদা চামড়ার ম্যানেজার এ সব কিছু করলেও শ্রমিকদের প্রতিবাদ করার সুযোগ ছিল না, কখনো কখনো প্রতিবাদ করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদালত কিংবা প্রশাসন তাদেরকে দায় থেকে অবমুক্ত করে দিতো আর এখন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন হয়েছে, প্রচার মাধ্যমের নজর পড়তে পারে, আইনের ফাঁক গলে ম্যানেজাররা তাদের দায় থেকে মুক্তি পাবে না এই ভয় এবং শিক্ষা বরং তাদের আচরণকে পর্যায়ক্রমে সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করেনি, বাগানের ম্যানেজার ঔপনিবেশিক কালের ম্যানেজারদের মেজাজে জীবন যাপন করবেন–এটাই চা বাগানের প্রশাসনিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ম্যানেজার থেকে পর্যায়ক্রমে বাবু-ষ্টাফদের প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্যের কঠোর নিয়ম মেনে চলা প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ম্যানেজারের বাংলোতে ৬ থেকে ১৪ জন শ্রমিক ফাই-ফরমাস খাটে, কাজের আদেশ বুঝে নিতে যখন সামনে আসে তখন তারা কখনো চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। প্রতিটি বাংলোর সামনে এবং পিছনের দিকে আলাদা আলাদা প্রবেশপথ রয়েছে, গবেষক শ্রমিকদেরকে কখনো সামনের গেইট বা দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখেননি। গবেষণাধীন ও প্রাক গবেষণাধীন বাগানে দেখা গেছে যে বাংলোতে ম্যানেজারের সামনে চেয়ারে যতক্ষণ ম্যানেজার না বলেন ততক্ষণ ডাক্তার বসেন না, দাঁড়িয়ে থাকেন, জুতো নিয়ে প্রবেশ করেন না। ম্যানেজারের স্ত্রীকেও তারাও যথেষ্ট সম্মান করে থাকেন। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার ও ডাক্তারকে বসতে বলবেন না, অথবা তিনি বসবেন না ততক্ষণ তারাও আসন নেন না। গবেষক দেখেছেন যে, এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারদের বাংলোতে কোন মেহমান আসলে ম্যানেজারের বাংলোতে সাধারণত তাদের আমন্ত্রণ করা হয়, এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজাররা বাগানের বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়ে ফিরে আসার পরপরই তাকে অবশ্যই ম্যানেজারের বাংলোতে যেতে হয়।

বাংলোর মতো অফিসেরও আলাদা ডেকোরাম রয়েছে। ম্যানেজারের অফিস কক্ষে ম্যানেজারের বসবার চেয়ার ছাড়া আরো চেয়ার থাকলেও তাদেরকে সেখানে বসবার অনুমতি দেয়া হয় না। গবেষক লক্ষ্য করে দেখেছেন যে ম্যানেজারের সামনে ডাক্তার ও এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজাররা সবসময় হাত কচলে কথা বলেন, শ্রমিকরা সহজে তাদের সামনে আসতে চায় না, আর কখনো যদি এসেই পড়তে হয় তখন তারা ভয়ার্ত ভঙ্গিতে আদেশের জন্য অপেক্ষা করে। ম্যানেজারের সামনে তাদের দাঁড়ানো কিংবা বসার ভঙ্গিটিও সাবলীল নয়।

ম্যানেজমেন্টর আদেশ অমান্য করা কিংবা এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না- এই মূল্যবোধ তৈরী করে দিয়েছে চা-কর সাহেবরা, এই মূল্য তৈরীর পেছনে ভয় প্রদর্শন আর নির্যাতনেরও ইতিহাস রয়েছে। শ্রমিকদের আদেশ মেনে চলতে, নির্দেশ পালনে সামান্য ভ্রান্তি কিংবা সময় ক্ষেপণের জন্য শ্রমিকদের কিভাবে নির্যাতন করা হতো। আলোচনায় দেখো গেছে যে, শ্রমিকদের নির্যাতন বা নিপিড়নের বিষয়টি এত বেশি ঘটতো এবং অপরপক্ষে এর জন্য আদালতে বিচারপ্রাপ্তি এতই কম হতো যে, শ্রমিকরা নির্যাতনকে সহ্য করে নিয়েছিল। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ম্যানেজারদের আদেশ অমান্য করা যায়

না, সাহেবরা সকল দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, তাদের অনুমতি ছাড়া কোন কিছু করা এমনকি ভাবাও অনৈতিক। এই বিশ্বাস ম্যানেজমেন্টের সকল কর্মকাণ্ডের প্রতি নিরব সমর্থন দিয়ে বৈধতা প্রদান করে।

ম্যানেজমেন্টের কাছে শ্রমিকরা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মতো। শ্রমিকদের সাথে তারা সর্বাদাই দূরত্ব বজায় রাখেন, কিন্তু এদেরকে দিয়েই তাদের দৈনন্দিন সকল কাজ করিয়ে নেয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। আরো একটি সত্য হলো এই যে, যে শ্রমিকরা ম্যানেজারের বাংলো কিংবা অফিসে কাজ করে তাদেরকে বেয়ারা আর 'তুই' বলে সম্বোধন করে, গবেষণা এলাকায় কখনো ম্যানেজারকে তাদের নাম ধরে ডাকতে দেখা যায় না। আবার, ম্যানেজাররা সাধারণত শ্রমিকদের সরাসরি নির্দেশ প্রদান না করে বাবু-ষ্টাফদের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদানের কাজ করে থাকেন। বাবু-ষ্টাফরা শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্ট এর মধ্যে সেতুবন্ধের মতো কাজ করে। ম্যানেজারদের মতো বাবু-ষ্টাফরাও শ্রমিকদের বাড়ি যায় না, আবার ম্যানেজারের বাংলোতে বাবু -ষ্টাফরা গেলেও জুতো নিয়ে সিঁড়ি পাড় হতে পারে না, একই বসার চেয়ারে বা পাশের চেয়ারটিতে অন্যের বসবার রেওয়াজও নেই। ম্যানেজমেন্টের এই আচরণ তাদের সাম্রাজ্যবাদী চেহারাকে উম্মোচিত করে। গবেষক গবেষণা এলাকা বাছাই জরিপের জন্য প্রথমে সিলেটের শহরতলীর যে বাগানটিতে গিয়েছিলেন তার ম্যানেজার আক্ষেপ করে বলেছিলেন অতীতের ম্যানেজারদের তুলনায় তারা এতটা রক্ষণশীল এবং কঠোরও নন। কিন্তু সেই বাগানের একজন শ্রমিক তার পূর্বপুরুষের কথা যখন গবেষকের কাছে বলছিল তখন ম্যানেজার কাছাকাছি চলে আসলে *সাহেব আসছে* এই কথা বলে সে তার কথা থামিয়ে দেয়। বাগানের বাইরে কিংবা বাহির থেকে কেউ বেড়াতে এলে তাদের সাথে কথা বলবার সুযোগ বর্তমানে থাকলেও এক সময়ে তাদের এই বিষয়ে কঠোর বিধি নিষেধ মেনে চলতে হতো। অর্থাৎ তারা কোথায় বেড়াতে যাবে, কারা তাদের বাড়ী বেড়াতে আসবে কত দিন থাকবে এর সবকিছুই ম্যানেজারদের গোচরে আনবার নিয়মটি বহাল রয়েছে। এভাবে শ্রমিকদের আচরণ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

এই আচরণের ধরন প্রমাণ করে যে, মালিক পক্ষ শ্রমিকদের সাথে প্রভু-ভৃত্ত সর্ম্পক বজায় রেখেছে। ম্যানেজাররা নিজেরা ইচ্ছা করলেও এই কাঠামোর বাইরে আসতে পারে না। চাকুরিতে প্রবেশ করার সাথে তাদের এমন ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয যে, তারা মানসিকভাবে নিজেদেরকে বৃটিশ চা-করদের উত্তরসূরী হিসেবে ভেবে ভেবে তাদের মতো চরিত্র ধারণ করে, আর যারা এই সংস্কৃতির সাথে নিজেদের মেলাতে পারেন না তারা এক সময় ভিন্ন চাকুরির সন্ধান করতে শুরু করে। আর যারা চা-করদের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে তারা মনে করে যে, ম্যানেজমেন্ট-শ্রমিকদের প্রচলিত সম্পর্ক কাঠামোর পরিবর্তন শুধু ঐতিহ্যের পরিবর্তন কিংবা শ্রমিকদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের পরিধিই হ্রাস করবে না, বরং বাগানের শৃঙ্খলাও ভঙ্গ করবে। শ্রমিকরা কাজে ফাঁকি দেয়, দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় ভাল আছে, বাগানের সম্পদ চুরি করে ইত্যাদি নানা নেতিবাচক বক্তব্য বাইরে প্রচার করে শ্রমিকদের উপর তাদের আধিপত্যবাদী ভূমিকাকে জায়েজ করবার প্রচেষ্টা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট তার আধিপত্যবাদী মূল্যবোধ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ চা বাগানের ঐতিহ্য ও রেওয়াজ রক্ষা করে আসছে, রাষ্ট্রও তাদের পক্ষে থেকেছে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে নিজেদের ক্ষমতাকে সুসংহত করার গোপন বাসনা নিয়ে। ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পরিবর্তন আসলেও ম্যানেজমেন্ট ও চা শ্রমিক এর প্রভু-ভৃত্ত সম্পর্কের ভাঙ্গন হয়নি। চা শ্রমিকরা ম্যানেজমেন্টের এই আধিপত্যবাদী আচরণ সবসময় নিরবে সহ্য করেছে তা' নয়, তাদের আন্দোলন সংগ্রামেরও ইতিহাস রয়েছে। শ্রমিকরা ম্যানেজমেন্টের আচরণের প্রতিবাদে কখনো কখনো সমস্বরে দাঁড়িয়েছে কিন্তু

শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং বৃহৎ সাংগঠনিক শক্তি না থাকায় এই দাঁড়ানোটা স্থায়ী হতে পারেনি। নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং চা-জনগোষ্ঠীর সাথে দেশের মূল জনগোষ্ঠীর দূরত্বের কারণে।

উপসংহার

চা আবাদ ও উৎপাদন এবং বিস্তারের সাথে ঔপনিবেশিক শাসকদের মুনাফা লাভের বিষয়টিই ছিল মুখ্য। সস্তায় শ্রম ও নামমাত্র মূল্যে জমির মালিকানা লাভ চা শিল্পে বিদেশী বেনিয়াদের পুঁজি বিনিয়োগের অন্যতম একটি কারণ। লাভজনক এই শিল্পের উপাদানের দিক থেকে প্রথম ঘাটতি ছিল শ্রমিকের যারা গায়ে খেটে জঙ্গল পরিস্কার করে চা বাগান তৈরী করে দেবে। এ অবস্থায় মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নানা কায়দায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদিবাসিদের স্বপরিবারে নিয়ে আসা হয়েছিল আঁসাম ও সিলেটের চা বাগান এলাকায়। দেশ ছেড়ে আসা এই শ্রমিকেরা যেন অর্থ সঞ্চয় করে নিজ দেশে ফিরে যেতে না পারে সেজন্য তাদেরকে নানা কায়দায় আর কৌশলে বাগানের বাইরে যাবার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপরও শ্রমিকরা শোষণ আর নিপড়নের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একযোগে মুল্লুকে যাবার জন্য পা হেটে রওয়ানা হয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা সফল হতে পারেনি। এই আন্দোলনে তারা ব্যর্থ হলেও নিজেদের অধিকার আদায়ে আন্দোলনের সবক তারা এখান থেকেই নিয়েছিল। তারপর এক সময় তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলে, বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দেয়, কিছু কিছু অধিকারও অর্জিত হয়েছে কিন্তু শোষণের অবসান ঘটেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটবার পর নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যস্থায় চা-শ্রমিকদের নির্যাতনের মাত্রা কমেছে কিন্তু সস্তায় শ্রম শোষণের ব্যবস্থাটি ঠিকই বহাল থাকে এবং তারা পূর্বের মতো প্রান্তিক অবস্থায় রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে চা-শ্রমিকদের কল্যাণ ও উন্নয়নের কর্মসূচি নিয়ে রাষ্ট্র ও দাতা/সাহায্য সংগঠন নামের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি উপস্থিত হলেও তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়; কেননা এই ধরনের কর্মসূচি শ্রমিকদের মানবিক মর্যাদা প্রদান বা তাদের অবস্থার উন্নয়ন না করে বরং দারিদ্র্য এবং নিপিড়ন যন্ত্রের উপর একটা কসমেটিক প্রলেপ দিয়ে সাময়িক সময়ের জন্য ঢেকে দিচ্ছে মাত্র, শ্রমিকদের উন্নয়নের নামে তারা বিলাসী জীবনযাপন করছে, আন্দোলন-সংগ্রামের সম্ভাবনা তৈরী করতে দিচ্ছে না। এক সময়ে যে চা -শ্রমিক ইউনিয়ন অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করেছিল সেই ইউনিয়ন এখন বাংলাদেশের অন্যান্য এনজিও'র মতো প্রজেক্ট আর অর্থ সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত।

ঔপনিবেশিক কাল থেকেই ভিন্ন এক প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে চা বাগান পরিচালিত হয়ে আসছে। চা শিল্প আধা কৃষি ও আধা যান্ত্রিক, ম্যানেজমেন্ট এখানে শ্রমিকদের মানবিক চাহিদা বা মর্যাদার পরিবর্তে উৎপাদনকেই গুরুত্ব দিয়ে আসছে, শ্রমিকরা তাদের কাছে যন্ত্রের মতো। ম্যানেজমেন্ট, বাবু-ষ্টাফ আর শ্রমিক এই তিন শ্রেণী নিয়েই চা বাগান, শ্রেণী বিভাজন স্পষ্ট, ম্যানেজমেন্ট তথা ম্যানেজার ও এ্যাসিষ্টেন্টরা শুধু চা উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক নয় অন্যান্যদের আচরণ ও জীবনযাপনের পদ্ধতিও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, শ্রমিকদের সাথে তাদের আচরণের সংস্কৃতি ইউরোপের দাস মালিকদের আচরণের চেয়েও অনমনীয় ও অমানবিক ছিল। বাবু-ষ্টাফরা মর্যাদাগত বিচারে মধ্যমশ্রেণীর, ম্যানেজমেন্ট এর আদেশ-নির্দেশের উপর ভিত্তি করে তারা শ্রমিক শ্রেণীকে পরিচালিত করে থাকে এবং নিজেদের কাজের জন্য ম্যানেজমেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। সামাজিকভাবে এক দিকে ম্যানেজমেন্ট তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে, অপরদিকে তারাও শ্রমিকদের সাথে মিশতে পারে না। কার্যত ম্যানেজমেন্ট ও বাবু-ষ্টাফ উভয় শ্রেণীর কাছেই শ্রমিকরা অস্পৃশ্য।

তথ্য নির্দেশিকা

K Ravi Raman, The Empire's Commodity Chain: Indian Tea in the World Economy (1840-1947), Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram, Kerala, India

দূর্গা প্রসাদ ভট্টাচার্য, চা-বাগিচাঃ কিছু তথ্য, কিছু ইতিবৃত্ত, *লোকশ্রুতি*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, বিশেষ সংখ্যা মার্চ ১৯৯২, পৃ: ১৪-১৫ ।

মৌলভী মাহাম্মদ আহাম্মদ, *শ্রীহট্ট দর্পণ*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২ (পুনঃ প্রকাশ), পৃ: ২২ ।

শিব শংকর মুখার্জি, "ইমারজেন্স অব বেঙ্গলী আন্ট্রোপ্রেনরস ইন টি প্লান্টেশেনস্ ইন জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স, ১৮৭৯-১৯৩৩", অপ্রকাশিত পিইচডি থিসিস ।

Thirty Successful Years for the Bangladesh Tea Industries, *Tea & Coffee Asia*, Vol. 4 No. 1, February-March-April 2002.

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষাণ্মাসিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এটি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি, এ-মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।

- লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টে ব্যবহার অনুসরণ করতে হবে :

  বাংলা কম্পোজ : "বিজয়-সুতন্নি এমজে" ফন্ট;
  ইংরেজী কম্পোজ : "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট;

- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।

- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্ত (পরিছন্ন কপি) সম্পাদক বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজের (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে যুক্ত করতে হবে।

- প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজিতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

- প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থস্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।

- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।

- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পর্ষদ -এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঊষা আর্ট প্রেস, ১২৪ লালবাগ রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মুদ্রিত।